

প্রাপ্তিস্থান—

এস. চক্রবর্তী

৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৬
অগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীশচীনন্দন চক্রবর্তী
১৬, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীস্বপনকুমার কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬



খরগোসের বুদ্ধি

গভীর বন। বনের রাজ্যে সিংহ…ভারী দুরন্ত। গর্ত থেকে সকালে বেরিয়ে যে জানোয়ারকে সামনে দেখে, ঝাঁপ দিয়ে তার ঘাড়ে প'ড়ে তাকে মারে—মেরে কোনোটার রক্ত চুষে খায়-কোনোটার মাংস খায়। পেট ভরে খায়। তবু সন্ধ্যা পর্যন্ত সিংহ বনে ঘোরে—ঘুরে কত জন্তু জানোয়ার মারে-পেট ভরে আছে, তবু মারে। জন্তু-জানোয়ার দেখলেই তাকে মারবে এমন তার স্বভাব।

তার ভয়ে জন্তু-জানোয়ারেরা গর্তে থাকে লুকিয়ে—বেরুতে পারে না। বেরুলেই, কে জানে, কোথায় সিংহ ওৎ পেতে-দেখলেই মারবে।

কিন্তু না বেরুলেও চলে না। খাবার-দাবার জোগাড় করতে হবে। তাদের মহা-বিপদ। গর্ত থেকে বেরুলে সিংহ মেরে ফেলবে-আবার না বেরিয়ে গর্তে চুপচাপ পড়ে থাকলে না খেয়ে মরণ। এ বিপদ থেকে কি ক'রে রক্ষা পাবে—কি খেয়ে তারা বাঁচবে?

একদিন অনেক রাত্রে যত হারা, ভেড়া, বরা,

খরগোশ—চুপিচুপি বেরুলো গর্ত থেকে—এখন সিংহ তারগর্তে ঘুমোচ্ছে। বেরিয়ে তারা বসলো মন্ত্রণা করতে—কি করে এ বিপদে বাঁচা যায় ?

মন্ত্রণায় একটা উপায় ঠিক হলো। তখন তারা ভিড় করে এসে দাঁড়ালো সিংহের গর্তের সামনে। সকাল হলে সিংহ বেরুবে বেরুলে তার কাছে জানোয়াররা জানাবে তাদের নিবেদন।

রাত পোহালো—সকাল হলো। ঘুম ভাঙতে হাই



তুলে গর্জন করে সিংহ বেরুলো গর্ত থেকে। বেরিয়েই দেখে, এক পাল জানোয়ার দাঁড়িয়ে গর্তের সামনে।

দেখে সিংহ অবাক। রোজ গর্ত থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে জানোয়ারদের সন্ধান করতে হয়—ত'ার

ভয়ে কে কোথায় থাকে লুকিয়ে– আজ তারা না লুকিয়ে তার গর্তের সামনে এসে হাজির।

সিংহ বললে - ব্যাপার কি ?

পশুরা বললে—আমাদের নিবেদন জানাতে।

তারা বললে পশুরাজ আপনার খিদে মিটে গেলেও আপনি আমাদের মারতে ছাড়েন না। তাতে হবে কি —কতকগুলো জানোয়ার মরে যাবার ভয়ে জঙ্গল ছাড়বে আর এত জানোয়ার পটাপট মরছে—রোজ রোজ এমনি মরতে মরতে বনে একটিও জানোয়ার থাকবে না– তখন কাদের নিয়ে আপনি রাজ্য চালাবেন ? আর তখন খাবেন কি ?

সিংহ বললে,- বুঝেছি। তা একটা ব্যবস্থা করো যদি তবে এত জানোয়ার আমি মারবো না।

তারা বললে—বলুন, কি আপনি করতে চান ?

সিংহ বলে রোজ সকালে আমি গর্ত থেকে বেরিয়ে ঐ গাছের তলায় এসে রোজ বসবো—আর তোমাদের মধ্যে একটি একটি জানোয়ার আসবে পালা করে আমার কাছে তাকে মেরে আমি খাবো। ব্যাস্ - তাহলে আমাকে বেরুতে হবে না।

এই ব্যবস্থাই হলো। তখন থেকে রোজ সকালে একটি করে জানোয়ার এসে বটগাছের তলায় হাজির থাকে—সিংহ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেই তাকে খায়।

জানোয়াররা মিলে পালা ঠিক হলো।

অনেকের পালার পর সেদিন খরগোসের পালা। খরগোশ আসছে আর মনে মনে মতলব ভাঁজছে—

তাই তো, কি করে প্রাণটা বাঁচানো যাবে? ভাবতে ভাবতে সে আসছে—তার পা চলতে চায় না—তবু চালাতে হচ্ছে। না হলে উপায় নেই।

সকাল হলো সিংহ এসে বসে আছে গাছের তলায় আজ খরগোসের আসবার পালা। তা খরগোসের দেখা নেই। রাগে সিংহের কেশর ফুলছে। সে ভাবছে—আর আধ ঘণ্টাটাক দেখবো তার পর হুঙ্কার তুলে বলবো—বেরিয়ে আয় জানোয়ারেরা বাইরে···কাকেও ছাড়বো না আজ জানোয়ারদের বংশ মেরে নির্বংশ করে দেবো!

সিংহ রাগে ফুলছে···ফুলছে। এমন সময় কাঁপতে কাঁপতে খরগোশ এসে দাঁড়ালো সামনে।

গর্জন তুলে সিংহ বললো—এত দেরী যে। করছিলি কি? খিদেয় আমার নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে!

জোড় হাত করে খরগোশ বললে—আমার কোন দোষ নেই, আমি ঠিক সময়ে আসতুম-আসতে পারলুম না শুধু একটি কারণে—

কি কারণ, শুনি? সিংহ তুললো গর্জন।

খরগোশ বললে আজ্ঞে পশুরাজ, আমি আসছি—পথে একটা কুয়া—যেই কুয়ার ধারে এসেছি-দেখি কুয়ার ধারে এক সিংহ। সে আমাকে খাবে বলে বসেছিল। আমি বললুম আমাকে প্রভু খাবেন, তাই আমি তাঁর কাছে চলেছি। তাতে সে বললে-কে তোর প্রভু?—ও···আমি তোর প্রভুকে দেখছি—তাকে মেরে এ বন আমি নেবো! যা—গিয়ে তাকে তুই বল—

এখান থেকে নড়বো না আমি—বসে থাকবো। এ কথা বলে তুই আমার কাছে আসবি—তারপর তোকে খাবো—তোর প্রভুকেও খাবো।

—কী। এত বড় আস্পর্ধা। আমার বনে ঢুকে অন্য বনের সিংহ এসে আমাকে শাসাবে? সিংহ বললে—কোথায় সেই কূয়া? কোথায় সে সিংহ? আমাকে দেখাবি চ—আগে তার এ আস্পার্ধার সাজা দেবো - তারপর আমি খাবো।

সিংহকে নিয়ে খরগোশ এলো কূয়াতলায়। কোথায় সিংহ? সিংহ বললে—কোথায় সে?

আজ্ঞে, দেখি, পশুরাজ? এ কথা বলে খরগোশ এলো কূয়োর ধারে—এসে কূয়োর মধ্যে দেখে তারপর এলো সিংহের কাছে এসে চুপি চুপি বললে—সে ঐ কূয়োর মধ্যে নেমে জল পান করছে, পশুরাজ।

—দেখাচ্ছি তার পান করা। বলে সিংহ এলো কূয়ার ধারে - কূয়ার ধারে গিয়ে দেখে - তাইতো? কূয়ার জলে নিজের যা চেহারা তারই ছায়া পড়েছে জলে—সিংহ তা বুঝলো না।

যেমন ছায়ার সিংহ দেখা অমনি ঝাঁপ দিয়ে সিংহ কূয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারপর

কূয়ার জলে ডুবে সিংহ মরে গেল। খরগোশ দুহাতে তালি বাজিয়ে লাফাতে লাফাতে চললো বনের জন্তু জানোয়ারদের এ খবর দিতে।

শরীরের বল কম—করো নাকো ভয়।
বুদ্ধি যার, বল তার—জানিবে নিশ্চয়॥



সিংহী আর শেয়ালছানা

এক সিংহ আর সিংহিনী। তাদের দুটি ছানা আছে। সিংহ রোজ শিকার করতে বেরোয়—সিংহিনী থাকে বাসায়—ছানা দুটিকে দেখে, তাদের নিয়ে খেলা করে; সন্ধ্যার সময় শিকার নিয়ে সিংহ বাসায় ফেরে—তখন সকলে শিকার-করে আনা জানোয়ারের মাংস খায়।

এমনি করেই তাদের দিন কাটে।

একদিন সারাক্ষণ এ বনে ও বনে ঘুরে সিংহ শিকার পেলো না। ভাবছে, তাইতো, ছানাদের, কি খেতে দেবো? ভাবতে ভাবতে, ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো, হঠাৎ দেখে, গাছতলায় পড়ে এতটুকু একটা শেয়ালছানা। ক্যাঁ ক্যাঁ করে কাঁদছে। তার বাপ আর মা ছানাকে ফেলে কোথায় গিয়েছে, তাদের চিহ্ন দেখা যায় না!

সিংহ ভাবলো, আজ যখন হরিণ-বরা মেলেনি তখন এই এতটুকু শেয়ালছানাটাকেই নিয়ে যাওয়া যাক। সিংহ-সিংহিনীর খেতে কুলোবে না—তা না কুলোক, ছানা দুটি তো খেতে পাবে—তাদের উপোস করে থাকতে হবে না।

শেয়ালছানাটাকে নিয়ে সিংহ এলো বাসায়। সিংহিনী বললে—শিকার ?

সিংহ বললে—আজ কোনো জানোয়ার পাইনি সিংহিনী! ভাবতে ভাবতে আসছি, ছানারা কি খাবে? এমন সময় দেখি, গাছতলায় এই শেয়ালছানাটা পড়ে কাঁদছে—নিয়ে এলুম। ওর দেহে কতটুকু মাংস—তবু ছানাদের পেট ভরবে তো।

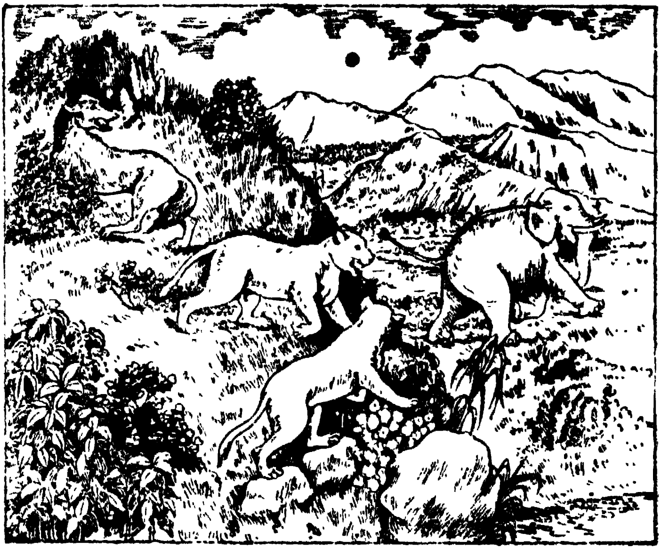
শেয়ালছানাকে দেখে সিংহীর মায়া হলো। আহা, মা-বাপ-হারা ছোট বাচ্চা। একে খাওয়া হবে না। সিংহিনী বললে সিংহকে না গো, এই এতটুকু বাচ্চা—আমার মায়া হচ্ছে! একে আমার নিজের বাচ্চার মত আমি পালন করবো এ হবে আমাদের বাচ্চাদের ভাইয়ের মতো, খেলার সাথী। আমার আর একটি বাচ্চা হলো আজ থেকে। দুটি ছিল, একে নিয়ে হলো তিনটি।

শেয়ালছানাকে মারা হলো না। সিংহিনী তাকে পালন করতে লাগলো নিজের ছানাদের সঙ্গে সমান আদরে। শেয়ালছানা জানলো, সিংহিনী তার মা আর সিংহিনীর বাচ্চা দুটি তার দুই দাদা।

তিনজন একসঙ্গে থাকে, খায় দায়, শোয়, খেলা

করে—তিনজন তিনজনকে ভালোবাসে। শেয়াল বলে কেউ তাকে ছোট করে দেখে না।

শেয়ালছানা খাসা আছে—এ যেন তার নিজের ঘর সিংহ সিংহিনী যেন তার নিজের বাপ মা।



একদিন হয়েছে কি, সিংহের বাচ্চাদের সঙ্গে শেয়ালের বাচ্চা বনে বেড়াচ্ছে, এমন সময় এক বুনো হাতী এলো শুঁড় নেড়ে তেড়ে। দেখে শেয়ালছানা আর এক মিনিট দাঁড়ালো না—ল্যাজ গুটিয়ে দে ছুট। সিংহের ছানারা ছোট কেশর ফুলিয়ে গর্জন তুলে রুখে দাঁড়ালো। দেখে হাতী পালালো!

তারপর বাসায় ফিরে সিংহের বাচ্চারা বললে মাকে—মাগো, ছোটর কি ভয়। বুনো হাতী দেখে একেবারে ভোঁ দৌড়। ছি, ছি, কি লজ্জার কথা!

শেয়ালছানা খেঁকিয়ে উঠলো—কী! আমায় তামাসা করা! আমি কি ভয়ে চলে এসেছি? আমার গায়ের জোর · আমার সাহস কি কারো চেয়ে কম। হুঁ আমি চলে এলুম, তার কারণ, হাতীটা একদম বুনো… ওর সঙ্গে লড়াই করতে আমার লজ্জা হলো।

শেয়ালের ছানা আরো অনেক কথা বললে। সিংহের ছানাদের যা-তা বলে গালাগালি দিতে লাগলো তারাই বা ছাড়বে কেন? তারাও দশ কথা শুনিয়ে দিলে।

কোনোমতে তাদের থামিয়ে শেয়ালছানাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সিংহিনী বললে—শোনো বাপু আসল কথা বলিঃ তুমি হলে জাত শেয়াল আর এরা সিংহ। এরা ছোটবেলা থেকে তোমাকে সিংহ বলেই জানে। এরা তোমাকে শেয়াল বলে জানতে পারলে বিপদ হবে। তাই তোমার আসল পরিচয় এরা জানবার আগে তুমি এখান থেকে সরে এখনি তোমার নিজের জাতের কাছে যাও। না হলে এরা হলো জাতে সিংহ তোমাকে শেয়াল বলে জানতে পারলে আর আস্ত রাখবে না—মেরে ফেলবে। এখন ডাগর হয়েছো তো!

একথা শুনে শেয়ালছানা কোনো জবাব না দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল—নিজের জাতের কাছে।

ভালো শিক্ষা ভালো সঙ্গ অনেকেই পায়।
জাতের স্বভাব তবু ছাড়া নাহি যায়॥



মস্ত ঝাঁকড়া বটগাছ—গাছের মগডালে বাসা বেঁধে বাস করে কাক আর তার বৌ। গাছের গুঁড়িতে মস্ত এক কোটর—সেই কোটরে থাকে কালকেউটে সাপ। বৌ-কাক যতবার ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে এক-এক বাচ্ছা ফুটে বেরোয়—কাক আর তার বৌ বেরোয় দিনের বেলায় খাবারের খোঁজে। অমনি কেউটে সাপটা তার কোটর ছেড়ে মগডালে উঠে এসে বাচ্ছাগুলোকে খেয়ে যায়।

বৌ কাক কাঁদে। কাককে বলে, এ গাছ ছেড়ে চলো। আমরা অন্য গাছে গিয়ে বাসা বেঁধে থাকি!

নিঃশ্বাস ফেলে কাক জবাব দেয়—আমার বাবা দাদামশাইয়ের আমলের বাসা। এ বাসা ছেড়ে কোথায় যাবো? নতুন জায়গাতেও বিপদ হতে পারে তো!

কাক-বৌ বলে—তা বলে আমাদের বাচ্চা হলে চিরদিন সাপ এসে তাদের খাবে? এর বিহিত করবেন না?

কাক বলে—আমরা ছোট পাখী। ও শত্রুর সঙ্গে কি করে পারবো?

বৌ-কাক বলে—যেমন করে পারো, এর বিহিত করো। নাহলে আমি এত দুঃখ সয়ে বাঁচতে পারবো না এ প্রাণ আমি রাখবো না!

কাক শুধু নিঃশ্বাস ফেলে। সাপকে জব্দ করবে কি করে ভেবে পায় না।

একদিন দূরের গাছ থেকে এলো কাঠ্‌ঠোকরা—কাকের সঙ্গে তার খুব ভাব। বৌ-কাক তাকে বললে দুঃখের কথা। বলল—যতবার বাচ্চা হয়, সাপ এসে খেয়ে যায়। বিহিত করতে পারি না। এমন করে কি বাঁচা যায়?

শুনে কাঠ্‌ঠোকরা বললে—সত্যই তো, এর বিহিত করতেই হবে! তা এসো আমার সঙ্গে—আমরা ওকে জব্দ করবো, এমন সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু আমার এক বন্ধু আছে·শেয়াল··বন্ধু··তার খুব বুদ্ধি। তার কাছে গিয়ে বলি—সে যদি সাপটাকে ঠিক করে দিতে পারে।

কাককে নিয়ে কাঠ্‌ঠোকরা এলো তার শেয়াল-বন্ধুর কাছে,—এসে শেয়ালকে কাকের বিপদের কথা বললে। বললে—এ সাপকে না মারলে বিহিত হবে না তো।

শেয়াল বললে—হুঁ। কিন্তু ওকে মারা আমাদের কর্ম নয়। জোরে পারবো না—তাছাড়া ওর বিষ ভয়ানক

কড়া—একটি ছোবল দিলে আর দেখতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মরণ।

কাঠ্‌ঠোকরা বললে তাহলে উপায়?

শেয়াল ভাবলো। ভেবে শেয়াল বললে—ভাবতে দাও—একটা উপায় বার করবোই।

সেদিন শেয়াল ভাবলো। সারাদিন ভাবলো। তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে-ঘুরতে মাথায় যদি কোনো মতলব আসে।

ঘুরতে-ঘুরতে শেয়াল এলো বড় দীঘির ধারে—রাজার দীঘি। দীঘির ধারে সার-সার ছাউনি। স্নান করতে রাজপুরী থেকে রাজা এসেছেন, রাণী এসেছেন, আর রাজকন্যা এসেছেন। তাদের সঙ্গে এসেছেন রাজকন্যার সখীরা—আর শান্ত্রী-পাহারার দল।

দীঘির পাড়ে গহনা খুলে রেখে রাজকন্যা তাঁর সখীদের নিয়ে দীঘিতে নেমেছেন সাঁতার কাটতে।

শেয়াল এলো ছুটে—এসে কাককে বললে—উড়ে এখন দীঘির ধারে চলো। রাজকন্যা তাঁর গলা থেকে মণিহার খুলে দীঘির পাড়ে রেখে জলে সাঁতার কাটছেন। সেই হার ছোঁ মেরে ঠোঁটে তুলে নিয়ে তোমার বাসায় তুমি যাবে উড়ে। তারপর আমি থাকবো সঙ্গে। যা করতে হয়, বলে দেবো।

কাক এলো বড় দীঘির পাড়ে। এসে দীঘির পাড় থেকে ছোঁ মেরে মনিহার তুলে আকাশে উঠলো। দেখতে পেয়ে শান্ত্রী-পাহারাদাররা লাঠি-সোঁটা নিয়ে

এলো তেড়ে। মণিহার ঠোঁটে কাক উড়ে চলেছে নিজের বাসায়। শাস্ত্রীরাও কাকের দিকে নজর রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে তাড়া করে চলেছে।

কাক এলো বাসায় শেয়াল আছে সঙ্গে। শেয়াল বললে—হয়েছে। ঝুপ করে ফেলে দাও সাপের কোটরে ঐ হার! তারপর দ্যাখো, কি হয়।



মণিহার কাক দিলে সাপের কোটরে ফেলে—শাস্ত্রীরা ঘোড়া ছুটিয়ে কাকের পিছনে তাড়া করে এসেছে। তারা দেখলো গাছের কোটরে মণিহার ঝক্মক্ করছে। নেবে কি? কোটরে ইয়া বড় কালকেউটে সাপ। নিতে গেলেই ফোঁশ করে ছোবল দেবে!

তারা তখন মোটা লাঠির ঘায়ে সাপকে এমন জোরে মারলো যে কেউটের দেহ থেঁৎলে চ্যাপ্‌টা। কেউটের হলো মৃত্যু। শান্ত্রীরা মণিহার নিয়ে ফিরে গেল দীঘির পাড়ে।

কাক আর বৌ-কাকের শত্রুনিপাত হলো। সকলের তখন কি আনন্দ।

যে-শত্রুকে পারিবে না শরীরের বলে।
শায়েস্তা করিবে তারে বুদ্ধির কৌশলে॥





গাঁয়ের পর বন-সেই বনে থাকে এক শেয়াল। গাঁয়ে লোকজন থাকে। তাদের গোয়ালে আছে গোরু-ছাগল ভেড়া। পুকুরে হাঁস, আরো কত পাখী। বাগানে কত রকম ফল। শেয়াল ভাবে-গাঁয়ে একবার ঢুকতে পারলে হয়! কী মজায় না ফল-পাকুড় খাবে-হাঁস-পাখী, ভেড়া-ছাগল খাবে! কিন্তু ভয় করে-গাঁয়ের লোকজন যদি তাকে দেখতে পায় লাঠি মেরে সাফ্ করে দেবে।

শেয়াল রোজ ভাবে। রোজ ভাবে-গাঁয়ে যাবে। কিন্তু ভয় করে বলে যেতে পারে না।

একদিন নিশুতি রাতে আকাশে চাঁদ ওঠে নি। শেয়াল গুড়্গুড় করে এসে গাঁয়ে ঢুকলো। একটা বাড়ীতে ঢুকবে—পাড়ার যত কুকুর ভৌ-ভৌ করে ডেকে উঠলো। তারা শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে তো। শেয়াল হলো কুকুরের দু-চোখের বিষ।

কুকুরের ডাক শুনে শেয়াল কেঁপে উঠলো। এই রে, সেরেছে। তখন কুঁক্ড়ি-শুঁক্ড়ি মেরে ল্যাজ গুটিয়ে সে চুপ্। কুকুরগুলো কিন্তু এ-অন্ধকারে

তাকে ঠিক দেখেছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভৌ-ভৌ রব তুলে তারা করলো শেয়ালকে তাড়া।

শেয়াল তখন বনের দিকে ছুটলো দিক্‌বিদিকের জ্ঞান নেই তার। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় দেখে, ডানদিকে একটা চালা-ঘর। একটি লোক কাপড় রঙ করে, তার ঘর। সামনে উঠান। উঠানে বড় বড় কটা গামলা কোনো গামলায় নীল রঙ গোলা—কোনো গামলায় হলদে, কোনটায় লাল রঙ গোলা। বেশ থিক্‌থিকে করে গোলা। শেয়াল সাঁ করে ঢুকলো সে-বাড়ীর উঠানে ঢুকেই কোনে দিকে চাওয়া নয়। ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লো রঙগোলা বড় একটা গামলার মধ্যে। গামলা-ভরতি রঙ। শেয়াল দিলে সেই গামলার মধ্যে ডুব।

কুকুরগুলো ভৌ ভৌ করে এলো, এদিকে-ওদিকে ঘুরলো। ভৌ ভৌ করে ডাকতে লাগলো খানিকক্ষণ শেয়াল ডুবে গেছে গামলার রঙের মধ্যে কুকুরগুলো দেখতে পেল না শেয়ালকে। তারা ভৌ-ভৌ করে চলে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেল। কুকুরদের ডাক আর শোনা যায় না। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ—শেয়াল তখন চুপি চুপি উঠলো গামলা থেকে। বুঝলো, কুকুরগুলো কাছাকাছি নেই। তখন সে খুব সাবধানে ল্যাজ গুটিয়ে সে-বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে বনে ফিরলো।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে বনের যত

জন্তু-জানোয়ার খাবারের খোঁজে বেরুল, হঠাৎ তারা দেখে সামনে এক আশ্চর্য রকমের জানোয়ার—খুব গাঢ় নীল রঙের জানোয়ার। এমন নীল রঙের জানোয়ার তারা কখনো দেখেনি।

শেয়াল ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে আছে তাদের দিকে—তার গায়ের রঙ নীল—তা সে জানে না! সে বললে—কি দেখছো তোমরা?

তারা বললে—তুমি কোন্ জাতের জানোয়ার গো? এত রঙের জানোয়ার আমরা এ বনে দেখ্ছি, কিন্তু তোমার মতো এত নীল-রঙের জানোয়ার কখনো চক্ষে দেখি নি তো।

তখন শেয়ালের মনে হলো, রাত্রে যে গামলার মধ্যে সে লুকিয়েছিল, সেটায় ছিল নীল রঙ; তার গায়ে সেই নীল রঙের ছোপ লেগেছে। এখন সে তাহলে আগের জীব নয়—নীল রঙের জীব।

শেয়ালের বুদ্ধি তো তার। সে তখন বললে আমি! ও, হ্যাঁ, তাহলে শোন আমি কে। আমাকে এ বনে পাঠিয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র। আমি তাঁর কাছেই আদরে যত্নে থাকি চিরকাল। তা দেবরাজ আমাকে বললেন, পৃথিবীর বনে তুমি যাও—সেখানে জন্তু-জানোয়ারদের রাজা নেই—তুমি তাদের রাজা হও গিয়ে। রাজা হয়ে জন্তু-জানোয়ারদের দেখবে শুনবে। তারা যাতে সুখে থাকে—দুঃখ-কষ্ট না পায়—কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ না করে—এই সব দেখবে তাদের রাজা হয়ে।

বটে! জন্তু-জানোয়াররা বললে,- বেশ, ভালো কথা—আজ থেকেই তুমি আমাদের রাজা হও। আমাদের কাকে কি কাজ করতে হবে বলে দাও।

শেয়াল বললে—সিংহ হবে আমার মন্ত্রী…বাঘ সেনাপতি, চিতা কোটাল, বানর হবে দূত, আর হাতী ধরবে আমার মাথায় ছাতা।

সব জানোয়ারদের এক একটি চাকরি মিললো—শুধু শেয়ালদের নয়! শেয়ালরা বললে আমাদের কি করতে হবে?

শেয়াল বললে- শেয়াল জাত ভারী পাজী রাজার ঘরে তাদের চাকরি মিলবে না। শেয়ালরা রাজপুরীর ধারেও আসবে না- এলে সাজা পাবে।

লজ্জায় অপমানে শেয়ালরা চলে গেল। তাদের মনে হলো রাগ। তাদের বুদ্ধির তারিফ করে সব জানোয়ার। আর দেবরাজের কাছ থেকে লালরঙের এক জানোয়ার এসে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু কি তারা করবে? তারা তুচ্ছ শেয়াল। আর ও হলো রাজা—রাজার সঙ্গে তর্ক করতে পারে না। তর্ক করতে গেলে গর্দান যাবে।

তারপর শেয়াল তার গায়ের ঐ নীল রঙের জোরে খাশা আছে। সিংহ বাঘ ভাল্লুক হাতী বড় বড় জানোয়াররা খাবার-দাবার নিয়ে আসে—এনে রাজার ভাণ্ডারে জমা করে। রাজা শেয়াল নিজে বেশ তোয়াজ করে পেট ভরে জানোয়ার খায় তারপর

বাকি যা থাকে, সেগুলো দেয় ঐ সব জানোয়ারদের খেতে। তারা রাজার উচ্ছিষ্ট পেয়েই খুশী।

সে যে শেয়াল— এ কথা এরা কেউ জানে না, জানতে পারে না—কাজেই রাজার খাতির করে।

কিন্তু একদিন এক ঘটনাঃ রাত্রে দূরের বনে শেয়াল ডাকলো—ক্যাহয়া ক্যাহয়া। সে-ডাক শুনে



বনের যেখানে যত শেয়াল ছিল, একসঙ্গে ডেকে উঠলো—ক্যাহয়া ক্যাহয়া—ক্যা-ক্যা ক্যা…

হাজার ডাক। নিজের জাতের ডাক। জন্মে ইস্তক এ ডাক ডেকে আসছে এখন রাজা হয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হয়—ক্যাহয়া ডাক ডাকতে পারে না। আজ জাতের ডাক শুনে শেয়ালের মন নেচে উঠলো,

মেতে উঠলো। সেও প্রাণপণে চীৎকার স্বরে ডাকলো ক্যা হুয়া ক্যাহুয়া ক্যা-ক্যা-ক্যা!

রাজার গলায় এ-ডাক শুনে সিংহ বাঘ হাতী রেগে উঠলো। সে-ডাকে শেয়ালকে চিনলো! চিনে ল্যাজ ঝেড়ে তারা বললে—তবে রে পাজী, তুই শেয়াল? আর শেয়াল হয়ে আমাদের হুকুম ফরমাস করে মজায় আছিস? এখনি আমরা তোর—

বলে আর কারো চোখে পলক পড়লো না। ঝাঁপিয়ে শেয়ালের ঘাড়ে পড়লো পড়ে দাঁতের ঘায়ে, নখের আঁচড়ে শেয়ালের ঘাড় থেকে মাথা উপড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

পরের সাজে আপন জাতকে তুচ্ছ করে যেই।
বিপদের তার নেই কো অন্ত, জেনো, অন্ত নেই॥



বৃদ্ধ বক



এক বক...বৃদ্ধ হয়েছে। শিকার করে মাছ ধরতে পারে না। তাই পুকুরের পাড়ে চুপটি করে বসে থাকে। ছিট্‌কে ছাট্‌কে দু চারটে ছোট মাছ যদি সামনে এসে পড়ে ধরে খায়। আর এমন চুপ-চাপ থাকে যে দেখলে মনে হয় বক মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

পুকুরে মাছ আর কাঁকড়ারা থাকে। একদিন এক কাঁকড়া এলো বকের কাছে, বললে—তোমার কি হয়েছে খুড়া? খাওয়া-দাওয়া নেই, দিনের পর দিন দেখি, চুপচাপ বসে আছো পুকুর-পাড়ে। শরীরও যা দেখছি, রোগা হয়ে গেছ হাড় জিরজির করছে। বলো তো, কি হলো তোমার। মাছে অরুচি হলো কেন?

নিঃশ্বাস ফেলে বক বললে—হুঁ, মনের দুঃখে খাওয়া দাওয়া ছেড়েছি রে কাঁকড়া।

কাঁকড়া বললে, কিসের দুঃখ খুড়া?

বক বললে—যখন ভাবনা চিন্তা ছিল না—তখন

কত মাছ ধরে খেয়েছি, কত কাঁকড়া মেরেছি—কিন্তু যে বিপদ ঘটবে—সে বিপদের কথা মনে হতে খিদে—তেষ্টা সব ভুলেছি রে।

কাঁকড়া বললে—কি বিপদ ঘটবে, খুড়ো?

বক বললে আমার বাসার পাশ দিয়ে কতকগুলো জেলে যাচ্ছিল তারা বলতে বলতে যাচ্ছিল যে কাল ভোরে এসে এ পুকুরে জাল ফেলে পুকুরে যত মাছ, কাঁকড়া, গুগলি, গেঁড়ি আছে সব ধরে নিয়ে যাবে। তাই ভাবছি—তোদের সকলকে যদি ওরা ধরে নিয়ে যায়, তাহলে পরশু থেকে আমি খাবো কি? তাই বসে বসে ভাবছি এত দিনের জানা পুকুর ছেড়ে কোথায় যেতে হবে মনে দুঃখ হচ্ছে খুব।

কাঁকড়ার ভয় হলো। কাঁকড়া বললে—কোথায় যাবে?

বক বললে—এখান থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের কোলে বড় দীঘি আছে। সে দীঘিতে অনেক মাছ অনেক কাঁকড়া সেইখানে যাবো।

এ কথা শুনলো পুকুরের যত মাছ। তারা এসে কেঁদে লুটিয়ে পড়লো বকের পায়ের কাছে। তারা বলতে লাগলো তুমি যাও যদি আমাদেরও নিয়ে চলো। যেমন করে পারো, এ বিপদে আমাদের রক্ষা করো।

বক বললে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী—মানুষ-লোকের সঙ্গে লড়তে পারি না তো। তবে তোমাদের বয়ে নিয়ে যেতে পারি সে দীঘিতে, তোমরা বাঁচলে আমিও

বাঁচবো তো। তা নিয়ে যেতে হলে ঠোঁটে ধরে দু-চারটে করে নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে আসবো কিন্তু।

—তাই, তুমি তাই করো। দেরি নয়—এখনি। মাছেরা জানালো কাকুতি।

বক তখন দু-চারটে করে মাছ ঠোঁটে করে নিয়ে যায়—যায় কাছাকাছি এমনি একটা পাহাড়ে। নিয়ে গিয়ে তাদের খেয়ে আবার ফেরে। এমনি করে সারা দিনে পঞ্চাশ-ষাটটা মাছ মেরে সাফ করলো।

এবারে কাঁকড়ার পালা। কাঁকড়া বললে - আমাকে নিয়ে চলো খুড়ো।

বক তখন কাঁকড়ার একটা দাড়া ঠোঁটে চেপে ধরে আকাশে উঠলো। কাঁকড়া চললো ঝুলতে ঝুলতে।

খানিক দূর গিয়ে বক বললে—ঐ পাহাড় দেখছো ঐ পাহাড়ের কোলে দীঘি। ঐ পাহাড়ে তোমাকে নামিয়ে দেবো—তারপর তুমি দীঘিতে নেমে যাবে।

এ-কথা বলে কাঁকড়াকে পাহাড়ে নামালো—কাঁকড়া দেখলো পাহাড়ের পাথরে রাজ্যের মাছের কাঁটা পড়ে আছে। দেখে সে বুঝলো বকের কাণ্ড। হতভাগা পাজি। মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে এত মাছ মেরে খেয়েছো—এবার আমাকে খাবার জন্য এনেছো।

বকের ঠোঁটে কাঁকড়ার একটা দাড়া আটকানো—আর একটা দাড়া খোলা—সেই দাড়া দিয়ে বকের লম্বা

গলা ধরলো চিমটের মত জোরে। তার দাড়ার টিপুনীতে বকের প্রাণ যায়—

বক পাহাড়ে নামলো কিন্তু তার ঘাড় কাঁকড়ার দাড়ার টিপুনীতে দুখানা।

তার কাটা মুণ্ড দাড়ায় করে নিয়ে কাঁকড়া ফিরলো পুকুরে। মাছেরা হা-পিত্যেশ করছে—



কখন বক ফিরে আসবে তাদের নিতে। কাঁকড়া এসে খবর জানালো। শুনে মাছেরা ভাবলো এমন পাজী বক।

কাঁকড়া বললে—বিপদ হবে শুনে ভয় পাওয়া ঠিক নয়।

বিপদে রক্ষার জন্য ধরো ভিন্ন জাতে।
পরিণাম জেনো মৃত্যু। লাভ নেই তাতে॥



গাঁয়ে থাকে এক ব্রাহ্মণ। এর বাড়ী তার বাড়ী ব্রাহ্মণ পূজো করে বেড়ায়। ব্রাহ্মণের গোয়ালে আছে দুটি গোরু। গোরু দুটিকে ব্রাহ্মণ নিজের ছেলেমেয়ের মতো যত্ন-আদর করে, নিজের হাতে তাদের সেবা করে। গোরু দুটি পাঁচ সের সাত সের করে দুধ দেয় রোজ। ব্রাহ্মণ দুধ খান, আর দুধ থেকে তৈরী করে ননী-ছানা-মাখন খান। গোরু দুটি দেখতেও খাশা।

গাঁয়ে থাকে এক চোর—এর বাড়ীতে পয়সাকড়ি চুরি, তার বাড়ী কাপড়-জামা চুরি করে—সুবিধা পেলে গহনা-গাঁটিও চুরি করে। ব্রাহ্মণের গোরু দুটি দেখে তার লোভ হলো—ও গোরু দুটো সে চুরি করবে।

ব্রাহ্মণের গোরু দুটির উপর তার লোভ খুব। একদিন সে লোভ আর সামলাতে পারলো না। রাত অনেক হলো চোরের চোখে ঘুম নেই—আজ রাত্রে সে ব্রাহ্মণের গোয়ালে ঢুকে গোরু দুটো চুরি করে আনবেই।

নিশুতি রাত। গাঁয়ের মানুষজন ঘুমে অচেতন। কোনোদিকে একটুকু শব্দ নেই। চোর এলো ব্রাহ্মণের বাড়ী। দেওয়ালে কান পেতে শুনলো-ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণের নাক ডাকছে। বুঝলো, ব্রাহ্মণ অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

পাঁচিল টোপকে বাড়ীতে ঢুকলো। বাড়ীর উঠানের কোণে গোয়াল। পাঁচিল টোপকে উঠানে নামতেই দেখে ড্যাবা-ড্যাবা চোখ এত বড় মাথা আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে -চোরও সেখানে নামলো।

চোর ভাবলো, এই রে—চুরির ভাগীদার এসে জুটেছে।

সে বললে -কে তুমি ?

সে বললে—আমি ভূত। তুমি কে ?

চোর বললে—আমি চোর।…এত রাত্রে চোরের মতো এখানে কেন ? কি তোমার মতলব ?

ভূত বললে,—বামুনকে আমি খাবো। ঘী দুধ ননী মাখন খেয়ে কি তেল-চুকচুকে নধর দেহখানি হয়েছে বামুনের। বামুন নয় তো, যেন ময়রার দোকান। ওকে খেলে একসঙ্গে সন্দেশ রসগোল্লা পানতুয়া ক্ষীর রাবড়ী খাওয়া হবে। তা তোমার এ বাড়ীতে কি মতলবে আসা, শুনি ?

চোর বললে—আমি এসেছি বামুনের গোরু দুটি চুরি করে নিয়ে যাবো বলে।

দুজনে নিঃশব্দে নামলো উঠানে। নেমে ভূত বললে—শোনো, তুমি এখন চুপ করে থাকবে।

গোরুর গোয়ালে যাবে না। আমি আগে বামুনকে খাই, তারপর তুমি চুরি করো তার গোরু।

চোর বললে—না, না, আমি আগে গোরু নিয়ে যাবো, আর তারপর তুমি বামুনকে খেয়ো। না হলে কে কোথায় জেগে উঠবে। তাছাড়া বামুনকে তুমি খেতে গেলে বামুন যদি হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে, পাশের বাড়ীর লোকজন এসে পড়বে। তাহলে আমার চুরি করা হবে না।

ভূত বললে তা হবে না। আমি আগে বামুনকে খাবো—খাওয়ার পর তুমি করবে তার গোরু চুরি। নাহলে তুমি গোয়ালে ঢুকবে, গোরু চ্যাঁচাতে পারে। গোরু দুটোকে নিয়ে যাবার সময় তারা হুটোপাটি করে চ্যাঁচাবে- বামুন উঠবে জেগে- আমার আর বামুনকে খাওয়া হবে না।

চোর বললে—না, আগে আমি চুরি করবো।

ভূত বললে—না, আমি আগে বামুনকে খাবো।

দুজনের তর্ক শুরু হলো। দুজনেই চায় আগে নিজের কাজ সারতে। শেষে চ্যাঁচামেচি, চীৎকার—হাতাহাতি হবার জো।

সে-গোলমাল শুনে বামুনের গেল ঘুম ভেঙে। বামুন উঠে উঠানে এলো। এসে দুজনকে দেখে চমকে বললে,- কে তোমরা ?

চোর বললে এ হলো ভূত- তোমায় খেতে এসেছে।

ভূত বললে—আর এ হলো চোর—তোমার গরু দুটিকে চুরি করে নিয়ে যাবে বলে এসেছে।

—বটে! বলে বামুন রাম নাম করতে করতে একখানা লাঠি হাতে চোরকে মেরে তাড়ালো। ভূত



আর চোর দুজনেই তখন ভয়ে ভয়ে দে ছুট, ছুটে দুজনে পালালো। ব্রাহ্মণ প্রাণে বাঁচালো, আর গোয়াল ঘরে গরু দুটোও রক্ষা পেলো—চুরি গেল না।

দুটি শত্রু একসাথে চলে হানাদার।
পাকে চক্রে তারা ঠিক করে উপকার।।



বনে একটা গাছের ডালে বাসা বেঁধে থাকে চড়ুই আর চড়ুইবৌ তাদের বাচ্চা নিয়ে। একদিন গ্রীষ্মের রোদে তেতেমেতে বিরাট এক হাতি এলো সেই গাছের তলায় ছায়ায় জিরুবে বলে। সে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকে না—শুঁড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে গাছের এ-ডাল ও-ডাল ভেঙে যেন আর গাছটাকে আস্ত রাখবে না। শেষে শুঁড় নেড়ে ভাঙলো চড়ুইদের বাসা যে-ডালে, সেই বাসাটা। সে ডাল ভাঙতে বাচ্চাগুলো মাটিতে পড়ে মরে গেলো; চড়ুই আর চড়ুইবৌ উড়ে কোনোমতে প্রাণে বাঁচালো।

বাচ্চাদের শোকে চড়ুইবৌর তারপর কী কান্না! তারা ছোট বলে বড়রা এমনভাবে অত্যাচার করবে! ছোটদের প্রাণও প্রাণ—তা তারা বুঝবে না। চড়ুইকে

চড়ুইবৌ বললে—এর বিহিত তুমি করো। আমাদের বাচ্চাদের মেরে ও পার পাবে কেন?

চড়ুইয়ের বন্ধু কাঠ্ঠোকরা। কাঠ্ঠোকরাকে চড়ুই গিয়ে দুঃখের কথা বললো।

কাঠ্ঠোকরা বললে—এর জন্যে ওকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু ও হলো হাতী, এত বড় দেহ,



আমরা অতি ক্ষুদ্র পাখী। তা হোক। ছোট আমরা জোট বেঁধে এর বিহিত করতে পারি কিনা, দেখি।

কাঠ্ঠোকরার বন্ধু রাজা-মশা। কাঠ্ঠোকরা তার কাছে গিয়ে এ-কথা জানালো। বললে,—তোমার

দলবল নিয়ে হাতীকে কামড়াও। তাহলে ও টিট হয়ে যাবে।

রাজা-মশা বললে—উঁহু, তাতে হবে না। ওর অত-বড় শরীর। আমরা ওকে কত কামড়াবো। তা নয়, চলো, আমার বন্ধু কোলাব্যাঙের কাছে। তার সঙ্গে যুক্তি করে দেখি।

তারা এলো কোলাব্যাঙের কাছে। এসে তাকে মশা নিজেদের দুঃখের কাহিনী বললে—বড়দের এ জুলুম কত সয়ে থাকবো। এর সাজা দেওয়া দরকার—কি করে তা হবে, তুমি ভেবে চিন্তে ঠিক করো।

কোলাব্যাঙ ভাবলে—ভেবে সে বললে,—ঠিক হয়েছে। হাতীটা এখন গাছতলায় ঝিমুচ্ছে তো। রাজা-মশা যাও তোমার রাজ্যের মশাদের নিয়ে ঠিক তার কাণের কাছে, সকলে মিলে গুণ গুণ ভোঁ ভোঁ সুর ধরো গিয়ে—কামড়াবে না। তোমাদের ভোঁ ভোঁ সুরে হাতী চোখ দুটি বুজে ঘুমোবে আরাম করতে, ও ঘুমোলে কাঠ্‌ঠোকরা ওর চোখ দুটি ঠোঁটে ঠুকরে উপড়ে নেবে—হাতী হবে কানা—চোখে দেখতে পাবে না। আর ঐ যে দেখছো মস্ত একটা কূয়ো আমি আমার দলবল নিয়ে ঐ কূয়োর ভিতরে ঢুকে গ্যাঁ-গোঁ গান ধরবো। হাতী ভাববে, বর্ষা নামছে, পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে। কানা চোখে ও কিছু দেখতে পাবে না—আমাদের ডাক শুনে কূয়োর মধ্যে ঝাঁপ দেবে—ব্যাস, তাহলেই ও ফর্সা।

কোলা ব্যাঙের কথামতো তাই করা হলো। কানা চোখে হাতী ঠিক কূয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো ব্যাঙের ডাক শুনে—যেমন পড়া, অমনি হাড়গোড় ভেঙ্গে হাতীর মৃত্যু।

ছোটর উপর জেনো, বড় যদি করে অত্যাচার।
ছোটরা বাঁধিলে জোট, অনায়াসে হবে প্রতিকার॥





গাধার গানে পাওয়া

এক গাধা—দিনের বেলায় ধোপার মোট বয়—সন্ধ্যার পর ধোপা তাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। তখন গাধাকে দেয় খেতে; তারপর গাধার ছুটি। সারা রাত গাধা ছাড়া থাকে। সারা রাত মনের খেয়ালে গাধা এখানে সেখানে যেমন খুশী ঘুরে বেড়ায়।

রাতে ঘুরতে ঘুরতে তার এক বন্ধু জুটলো—শেয়াল বন্ধু! দুজনে রাত্রে এ চাষার ক্ষেতে, ও চাষার ক্ষেতে বেড়া ডিঙিয়ে ঢোকে—ঢুকে কোনো ক্ষেতের কাঁকুড় ফুটি সাফ করে—কোনো ক্ষেতের আলু কপি খায়, কোনো ক্ষেতে বা আর কিছু। আশ মিটিয়ে দুজনে খায়। এমনি ভাবে মজায় দুজনের রাত কাটে।

একদিন রাত্রে জ্যোৎস্নায় মাঠ-ঘাট আলোয় আলো। দুজনে চাষার ক্ষেতে ঢুকলে—ঢুকে পেট ভরে কাঁকুড় ফুটি খেলো।

খাবার পর গাধা বললে—এমন জ্যোৎস্না রাত—আমার গান গাইতে সাধ যায়।

শেয়াল বললে—বলো কি মামা—এমন কাজ করো না। ঢুকেছি চুরি করে খেতে—টুঁ শব্দ করা নয়। তার উপর তোমার গলার গান যেন এক হাজার শাখ বেজে উঠবে। গানের শব্দে পাঁচ সাতটা পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙবে ঘুম ভাঙলেই সকলে হৈ-হৈ করে ছুটে আসবে—তখন ধর পড়ে দুজনের যে দশা হবে বাপরে।

গাধা বললে—তা বলে এমন চাঁদনি রাতে গান গাইবো না। আমাকে গানে পেয়েছে। গান আমি গাইবোই!

শেয়াল বললে—তাহলে একটু সবুর করো, মামা, তোমার ও গলার আওয়াজ একবার বেরুলে কি রক্ষা থাকবে। গান যখন গাইবেই, তখন যতটা পারি, সাবধান হই।

গাধা বললে—তার মানে?

শেয়াল বললে—তুমি ক্ষেতে বসে গান গাইবে—আমি বেরিয়ে গিয়ে ঐ বেড়ার পাশে বসে চৌকিদারী করবো। তোমার গান শুনে মানুষজন আসছে দেখলেই আমি সাড়া দেবো। তখন আর একটুও দেরী নয়—বুঝলে মামা—একেবারে যাকে বলে, চোঁ-চোঁ দৌড়!

গাধা বললে—বেশ, বেশ, বেশ তাই তুমি করো। ভয়েই তুমি গেলে—ঐ তোমার মস্ত দোষ।

—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। বলে শেয়াল বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল! গাধা তখন গান ধরলো। সে যা বাজখাঁই আওয়াজ!

সে-আওয়াজে শেয়াল যা বলেছিল, তাই হলো। সারা পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গার রাগে আগুন হয়ে তারা দাঁড়দড়া আর লাঠি নিয়ে এলো তেড়ে। এসে দেখে, কাঁকুড় ক্ষেতে বসে গাধা বিটকেল ভাবে চ্যাঁচাচ্ছে। গাধা আপন-মনে চ্যাঁচাচ্ছে তার খেয়াল নেই, মানুষ এসেছে।

মানুষ-জন এসে লাঠি দিয়ে গাধাকে এমন মার



মারলো যে, মার খেয়ে গাধা হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এমন পড়া পড়লো যে আর উঠতে পারে না।

তারা তখন গাধা'র গলায় দড়ির ফাঁশ পরিয়ে সে দড়ির অন্য দিকে বাঁধলো—পাথরের একখানা বড় চাঁই পড়েছিল সেই পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে। তার পর বললে—আজ রাত্রে পড়ে থাকো। কাল সকালে এসে

লাঠির চোটে তোমার পিঠের ছাল দেবো ছাড়িয়ে। রোজ রোজ ক্ষেতের ফসল নষ্ট করতে আসা!

এ কথা বলে লোকজন চলে গেল—যে যার বাড়ী।

তারা চলে যাবার পর শেয়াল এল গুটিগুটি, ডাকলো মামা···

গাধা তখন বাঁধা পাথরসুদ্ধ ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে উঠে দাঁড়িয়েছে—রাত্রেই যেমন করে পারে পালাতে হবে।

শেয়াল বললে—গান গেয়ে খুশী হয়েছ তো! তখন তোমাকে মানা করলুম—ও গলায় গান গেয়ো না—আমার কথা শুনলে না। গানের জন্যে লাঠির ঘায়ে পিঠে দাগড়া-দাগড়া ফুলেছে···আর গলায় দেখছি পাথরের পদক! কোন মানুষ-গাইয়েও গান গেয়ে এমন পদক পায়নি কারো কাছে, মামা।

নিজ-বুদ্ধি সেরা ভাবি দর্পে অতিশয়।
হিতকথা না শুনিলে বিপদ নিশ্চয়॥



অতিবুদ্ধি মাছ

গ্রামের শেষে প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘিতে দুটি মাছ আর একটি ব্যাঙ তিনজনে খুব ভাব। মাছ দুটির মধ্যে একজনের নাম হাজার-বুদ্ধি আর একজনের নাম একশো বুদ্ধি। তিনজনে খায়-দায়—জলের বুকে খেলা করে ভেসে বেড়ায়। তিনজনে বেশ আছে।

একদিন সন্ধ্যা হয়-হয়, তিনজনে ডাঙার ধারে জলে ভেসে গল্প করছে। এমন সময় ক'জন জেলে এসে জলের ধারে ডাঙায় দাঁড়ালো। দীঘির পানে চেয়ে চেয়ে একজন জেলে বললে—এ দীঘিতে অনেক মাছ গো-জলও তেমন গভীর নয়। কাল সকালে আমরা এসে এই দীঘিতে জাল ফেলবো।

এ কথা বলে জেলেরা গেল চলে।

ব্যাঙের ভাবনার সীমা নেই। তাইতো সারা দীঘি জুড়ে-সকালে যদি জাল ফেলে তাহলে সে জালে রুই কাৎলা মাছ থেকে চুনো পুঁটি কেউ কি আর বাদ পড়বে। জেলেরা মাছগুলো নিয়ে যাবে,—ব্যাঙ আর

গেঁড়িগুগলিদের ফেলে দিয়ে যাবে। তা করলে ব্যাঙের মরণ নিশ্চিত।

সে তখন তার দুই মাছ বন্ধুদের বললে—কাল সকালে আমাদের আর বাঁচতে হবে না। তাই আমি বলি, আজ রাত্রেই চলো, এ দীঘি ছেড়ে দূরে কোন দীঘিতে গিয়ে আমরা আশ্রয় নিই।

মাছ-বন্ধুরা-বললে - ক্ষেপেছো বন্ধু। এ দীঘিতে চোদ্দ পুরুষ ধরে বাস করছি আর ওরা জাল ফেলতে আসবে বলে ভয়ে এ দীঘি ছেড়ে পালাবো।

ব্যাঙ বললে—তাহলে বাঁচবে কি করে?

হাজার-বুদ্ধি বললে - বুদ্ধি…বুদ্ধির জোরে বাঁচবো! আমার বুদ্ধি হাজার রকমে হাজার-দিকে খেলে। যাকে বলে অতিবুদ্ধি—ওরা এসে ফেলুক জাল। আমি হাজার রকম বুদ্ধি খেলিয়ে ঠিক ছিটকে পালাবো - ওদের জালে ধরা পড়বো না।

একশো বুদ্ধি মাছ বললে -আমারো ঐ অতি বুদ্ধি। আমার নাম একশো-বুদ্ধি। আমার মাথায় একশো রকম বুদ্ধি খেলে সেই একশো বুদ্ধি খেলিয়ে আমিও জাল এড়িয়ে থাকবো।

ব্যাঙ বললো তোমাদের বেশীবুদ্ধি। তাই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে এ-কথা বলছো ভাই। আমার নাম এক-বুদ্ধি - মানে, আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। আর সে বুদ্ধিতে আমি বুঝেছি, এ দীঘিতে থাকা নিরাপদ নয়। আমি তাই আজ রাত্রেই এ দীঘি ছেড়ে যতদূরে দীঘি পাই সেখানে গিয়ে থাকবো

মাছ বন্ধুরা কত মানা করলো ব্যাঙকে—তার ভয়ের জন্য তাকে কত ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগলো। ব্যাঙ সে-সব গ্রাহ্য না করে সেই রাত্রেই এ দীঘি ছেড়ে—এ তল্লাট ছেড়ে সরে পড়লো!

পরের দিন সকাল হতেই একশো জেলে জাল ঘাড়ে করে দীঘির ধারে হাজির—সকলে মিলে প্রকাণ্ড



জাল ফেলে দীঘির পাড় থেকে জলে জলে সোজাসুজি জাল টানতে লাগলো! তাদের টানা জালেতে দীঘিতে ছোটবড় যত মাছ, কাঁকড়া-কাছিম, গেঁড়িগুগলি, ব্যাঙ ছিল সব পড়লো—মায় কাদা-পাঁক পর্যন্ত!

হাজার-বুদ্ধি আর একশো বুদ্ধি তাদের বুদ্ধি খাটিয়ে খাটিয়ে কোনমতেই জাল থেকে ছিটকে পালাতে

পারলো না! দুজনেই খুব বড় বড় রুই…কী ভারী ওজন! জলে ঐ দুটি এত বড় মাছ—এ জলের রাজা আর মন্ত্রী বললে চলে।

জল থেকে তুলে এ দুটি মাছকে জেলেরা তখনি মেরে ফেললো। তারপর মাছ, কাঁকড়া, কাছিমগুলো ঝোলায় তুলে জেলেরা চললো গাঁয়ের হাটে। হাজার বুদ্ধি আর একশো-বুদ্ধিকে নিলে দুজন জেলে আলাদা আলাদা—হাজার বুদ্ধিকে একজন জেলে নিলে মাথায় চাপিয়ে, একশো বুদ্ধিকে নিলে আর একজন তার কান্‌কো গলিয়ে মোটা দড়ি বেঁধে সেই দড়ি ধরে ঝুলিয়ে।

হাটে যেতে বাঁ দিকে ছোট একটা পুকুর পড়ে। জেলেরা খুশী মনে বক্‌তে বক্‌তে চলেছে সেই পুকুরের ধার দিয়ে সেই, পুকুরে এসে আশ্রয় নিয়েছে ব্যাং আর তার বৌ!

মানুষের বক্‌বকানি শুনে ব্যাঙ দেখলো চেয়ে - দেখে বৌকে বললে - দেখ বৌ, অতি বুদ্ধি দুই বন্ধুর দুর্দশা —হাজার রকম আর একশো-রকম বুদ্ধি খেলিয়েও জাল ছিটকে বাঁচতে পারলো না।

ব্যাঙ বৌ দেখলে—তাই তো বটে! দেখে সে বললে —এই জন্যেই কথায় বলে—

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি সর্বনাশের মূল!
বিপদ হলে অল্প বুদ্ধি হারায় নাকো কুল॥



মানুষ সবচেয়ে খল

এক ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণী আর তাদের একপাল ছেলেমেয়ে! ব্রাহ্মণ বড় গরীব—এ দোরে ও-দোরে ভিক্ষা মেগে যা পায়, তাতে কেউ তারা পেট ভরে খেতে পায় না। ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় ককিয়ে কাঁদে। ব্রাহ্মণীর হলো মায়ের প্রাণ—সহ্য হয় না। ব্রাহ্মণী দেয় ব্রাহ্মণকে গঞ্জনা—জোয়ান শরীর! ভিক্ষা না করে যদি কাজ-কর্ম করে, তাহলে এ দুঃখ-দুর্দশা ঘোচে! তা কখনো করবে না—আমাদের না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারতে চাও!

রোজ রোজ এমনি গঞ্জনা। ব্রাহ্মণ একদিন বিবাগী হয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরুলো। যেদিকে দু'চোখ যায় যাবে, বাড়ীতে আর থাকবে না সে।

চলতে শুরু করেছে। চারদিন চলার পর ব্রাহ্মণ এলো এক জঙ্গলে। খিদে-তেষ্টায় কষ্ট যা হচ্ছে, বলবার নয়। জঙ্গলে খিদের খাবার কোথায় পাবে? ব্রাহ্মণ ভাবলো, যদি কূয়া পাই, কি পুকুর পাই, তাহলে পেট ভরে জল খাবো।

খুঁজতে খুঁজতে দেখে একটা বড় কূয়া। জল খাবে বলে কূয়ার ধারে এসে দেখে, কূয়ার মধ্যে একটা বাঘ! কখন জল খেতে এসে কূয়ার ভিতরে পড়ে গিয়েছে।

ব্রাহ্মণকে দেখে বাঘ বললে,—আমাকে তোলো গো নাহলে আমি মরে যাবো। আমাকে কূয়া থেকে তুলে বাঁচাও দয়া করো।

ব্রাহ্মণের বুকখানা ধড়াস করে উঠলো! ব্রাহ্মণ বললে তুমি বাঘ তোমাকে তুলবো কি! যেমন তুলবো কতদিনের উপোসী আছো—আমার ঘাড় মোটকে টুক করে সন্দেশের মতো গালে পুরবে তো।

বাঘ বললে—না, না, না। আমি তিন সত্যি করছি ঠাকুর—তোমাকে আমি খাবো না, খাবো না, খাবো না। আমাকে তোলো—বাঁচাও, ঠাকুর।

ব্রাহ্মণের দয়া হলো। হোক বাঘ চোখের সামনে মারা যাচ্ছে। তার উপর তিন সত্যি করেছে—ব্রাহ্মণকে খাবে না! ব্রাহ্মণ তুললো বাঘকে। তুলেই পালাবার উদ্যোগ! বাঘ বললে পালাতে হবে না। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছো—তুমি আমার ভগবান! আমি তোমার উপকার করবো। তুমি কোথায় চলেছো?

ব্রাহ্মণ বললে—আমি চলেছি অনেক দূরে—কাজের চেষ্টায়।

বাঘ বললে—দূরে ঐ পাহাড় দেখছো, ঐ পাহাড়ের বুকে গুহা—সেই গুহায় আমি থাকি। যখন বাড়ী

ফিরবে, আমার সঙ্গে দেখা করো ঐ গুহায় গিয়ে—আমি তোমার উপকার করবো।

ব্রাহ্মণ বললে—আচ্ছা।

তারপর ব্রাহ্মণ জল খাবে—কূয়ার ভিতর থেকে একটি ইঁদুর বললে, আমাকে তোলো ঠাকুর তুলে বাঁচাও।

ব্রাহ্মণ তুললো ইঁদুরকে। ইঁদুর বললে—তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো—তোমার এ-উপকার কখনো ভুলবো না। কখনো যদি দরকার ভাবো, আমায় স্মরণ করো। যেখানেই আমি থাকিনা কেন—তোমার কাছে আসবো—তোমার কোনো কাজ থাকলে সে কাজ করে দেবো।

তারপর এক সাপ উঠলো চেঁচিয়ে আমাকে দয়া করে তুলে বাঁচাও, ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ বললে ও বাবা, তুমি কেউটে সাপ। তোমার যা বিষ। তোমাকে তুলি, আর তুমি আমায় দাও ছোবল। তাহলে আর বাঁচতে হবে না আমাকে।

সাপ তিন সত্যি করলে—না, না, না। তোমাকে আমি কামড়াবোনা। যত খল, যত পাজী হই, যে উপকার করে, তার কোনো অহিত করবো না—কখনো না, ওদের তুললে ঠাকুর।

সাপকেও তুললো ব্রাহ্মণ। তারপর কূয়ার ভিতর থেকে মানুষের গলা। আমি মানুষ, আমাকে তুলে বাঁচাও।

ব্রাহ্মণ বললে - বেশ, তুলবো !

তাকে তুলতে যাবে—বাঘ, সাপ, ইঁদুর তিনজনেই করলো ব্রাহ্মণকে মানা—উঁহুঁ—ওকে তুলো না। ও মানুষ—মুখে মিষ্টি কথা বললেও মানুষ কখনো উপকার মনে রাখে না। যে উপকার করে নিজের স্বার্থে তার ক্ষতি করতে মানুষের কখনো বাধে না! ওকে তুললে বিপদে পড়বে ঠাকুর !

ব্রাহ্মণ বললে—ক্ষেপেছো! তোমাদের তুললুম, আর ও মানুষ—নিজের জাত। ওকে তুলবো না, তা কখনো হয় ?

তাদের কথা ব্রাহ্মণ শুনলো না। তুললো সে মানুষকে।

মানুষ বললে, এ উপকার ভুলবো না। আমি হলুম স্যাঁকরা—যদি কখনো গয়না গড়াও, আমার কাছে এসো —খাঁটি সোনার গহনা তৈরী করে দেবো; এক পয়সা মজুরি নেবো না, ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ হাসলো। বললে পেটে ভাত জোটে না— আমি গড়াবো গহনা।

স্যাঁকরা বললে—বরাতের কথা বলা যায় না, ঠাকুর আজ তোমার এমন দশা, যদি বরাত তেমন হয় —হয়তো একদিন রাজা হতে পারো।

তারপর তারা চলে গেল! ব্রাহ্মণ জল খেয়ে আবার সেখান থেকে চলে গেল।

চলে, চলে দু-তিনটে দেশ ঘুরলো—কিন্তু

কোথাও কাজ মিললো না। না হলো এক পয়সা রোজগার। তখন আবার বাড়ী ফেরা!

ফেরার পথে মনে হলো,—বাঘের সঙ্গে দেখা করে যাবে। এই মনে করে সে এলো বাঘের গুহায়! বাঘ বললে বাড়ী চলেছো, ঠাকুর ?

—হ্যাঁ।

বাঘ দিলে ব্রাহ্মণকে খুব দামী একছড়া হীরের হার; বললে- এটা নাও ঠাকুর! এটা বেচলে অনেক টাকা পাবে!

হীরের হার পেয়ে ব্রাহ্মণ ভাবলো—কোথায় এ হার বেচবো ? মনে পড়লো সেই সেই স্যাঁকরার কথা। সে তার নাম বলেছিল! কোন্ সহরে থাকে, তাও বলেছিলো। ব্রাহ্মণ এলো স্যাঁকরার কাছে। স্যাঁকরা তাকে খাতির-যত্ন করে বসালো—খাবার-দাবার খাওয়ালো। তারপর বললে-কোনো কাজ থাকে তো বলো ঠাকুর! তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো- আমি তোমার নফর।

ব্রাহ্মণ তার হাতে দিলে সেই হীরের হার। হারটা নেড়ে-চেড়ে স্যাঁকরা চাইলো ব্রাহ্মণের দিকে, বললে—কি করতে হবে আমায় ?

ব্রাহ্মণ বললে—আমি বড় গরীব—এ হার নিয়ে কি করবো ? এ হার তুমি যদি বেচে দাও, তাহলে অনেক টাকা পাবো—আমার অভাব ঘুচবে।

স্যাঁকরা বললে—ও, তা, এ হার কোথায় পেলে ?

ব্রাহ্মণ বললে—বনে।

স্যাঁকরা ভালো করে হারটা দেখলো—দেখে এ হার সে চিনলো। জানে, এ হার এ রাজ্যের যুবরাজের। যুবরাজ ক'মাস আগে মৃগয়া করতে বনে গিয়ে ছিলেন—তিনি আর ফেরেননি। এ বামুন বলছে, এ হার পেয়েছে বনে!

স্যাঁকরার মনে নানা চিন্তা! স্যাঁকরা বললে—তুমি বসো ঠাকুর—এ হারের ব্যবস্থা আমি করছি।

এ কথা বলে ব্রাহ্মণকে ঘরে বসিয়ে স্যাঁকরা ছুটলো রাজবাড়ীতে। রাজার কাছে এসে বললে—মহারাজ যুবরাজের খবর পেয়েছি।

রাজা চমকে উঠলেন! বললেন—পেয়েছ! কোথায় যুবরাজ?

স্যাঁকরা তখন সেই হীরের হার দেখালো রাজাকে, বললে—যুবরাজের গলার হার!

রাজা চিনলেন। চিনে তিনি বললেন—তাই তো। কোথায় পেলে এ হার?

স্যাঁকরা বললে এক গরীব বামুন আমার কাছে এ হার বিক্রী করতে এসেছে। সে বলছে—বনে পেয়েছে এ হার। আমার সন্দেহ হয়, মহারাজ! নিশ্চয় যুবরাজ যখন বনে গিয়েছিলেন মৃগয়ায়—এ বামুন তখন তাঁকে খুন করে এ হার পেয়েছে।

রাজার দু'চোখ হলো রক্তবর্ণ! রাজা বললেন—বটে! সে বামুনকে আমি শূলে দেবো।

রাজা হুকুম দিলে শান্ত্রীকে ধরে নিয়ে এসো সে বামুনকে। স্যাঁকরা তাকে দেখিয়ে দেবে।

শাস্ত্রী গিয়ে ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে এলো। রাজা বললেন—আজ তুমি গারদে বন্ধ থাকবে—কাল তোমায় শূলে দেবো।

শাস্ত্রীকে রাজা হুকুম দিলেন—ওর হাত-পা শক্ত করে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে অন্ধকারে গারদে ওকে ফেলে রাখো।

হাত-পা বেঁধে ব্রাহ্মণকে অন্ধকারে গারদে বন্ধ করে রাখা হলো, ব্রাহ্মণ অবাক! কি তার অপরাধ?—স্যাঁকরা হীরার হার নিয়ে গেল—বলে গেল, ব্যবস্থা করবে। তা হারের ব্যবস্থা নয়, সে এলো শাস্ত্রী নিয়ে। এ সবের মানে? সে এখন ছাড়ান পাবে কি করে?

মনে পড়লো ইঁদুরের কথা। যেমন তার কথা মনে পড়া—ইঁদুর এসে হাজির। ইঁদুর বললে কি চাই?

ব্রাহ্মণ বললে—আমার বাঁধন কেটে দাও।

ইঁদুর তখনি দাঁত দিয়ে কুটিকুটি করে কেটে ব্রাহ্মণের বাঁধন দিল খুলে। ব্রাহ্মণের তখন মনে পড়লো সাপের কথা। মনে পড়তেই সাপ এসে হাজির! সাপ বললো কি করতে হবে?

ব্রাহ্মণ বললে—দেখলে আমার বিপদ। কেন এমন হলো। কি আমার অপরাধ?

সাপ—বললে এ মানুষ স্যাঁকরার কাজ। রাজার কাছে হার দেখিয়ে তোমার নামে মিথ্যা নালিশ করেছে, তুমি যুবরাজকে মেরে তার গলার হার

এনেছিলে বেচাতে। তোমাকে বলেছিলুম, মানুষের উপকার করো না। ওকে কূয়া থেকে তুলো না— তুমি আমাদের কথা শুনলে না। উপকার মানুষ কখনো



মনে রাখেনা। এখন বুঝোতো. আমাদের চেয়ে মানুষ কতখানি খল।

—হুঁ! এখন আমার রক্ষা পাবার উপায়?

সাপ বললে—উপায় করছি। আজ রাত্রে আমি এখানকার রাণীকে কামড়াবো। আমার বিষে রাণী মারা যাবে। বিষ ঝাড়াবার জন্যে রাজা বদ্যি ডাকবেন, রোজা ডাকবেন। কারো সাধ্য হবে না আমার বিষ ঝাড়তে। তখন হৈ-হৈ রব উঠবে, তুমি বলো গারদ থানার শাস্ত্রীকে, তুমি পারো বিষ ঝেড়ে রাণীকে

বাঁচাতে। তোমার ডাক পড়বে, তুমি গিয়ে রাণীর গায়ে হাত দেবামাত্র আমি আমার বিষ তুলে নেবো। রাণী বাঁচবে। তাহলেই রাজা তোমাকে দেবে খালাস।

তাই হলো। রাণীকে সাপে কামড়ালো—বদ্যিরা রোজারা কিছু করতে পারছে না—রাজ্য জুড়ে হৈ হৈ রব। গারদের শান্ত্রীকে ব্রাহ্মণ বললে- কিসের গোলমাল ?

তারা বললে—রাণীকে সাপে কামড়েছে, সাপের বিষ কিছুতে যাচ্ছে না।

ব্রাহ্মণ বললে- আমি জানি মন্ত্র—আমি পারি রাণীকে বাঁচাতে।

শান্ত্রী এসে রাজাকে এ কথা বললো। তখনি ব্রাহ্মণকে আনা হলো। ব্রাহ্মণ রাণীর গায়ে হাত দেবামাত্র সাপ নিলে তার বিষ তুলে···রাণী বেঁচে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের শূল মাপ, গারদ মাপ। রাজা তাকে বখ্‌শিস্ দিলেন একথলি সোনার মোহর।

তারপর রাজা জিজ্ঞাসা করলেন হারের কথা। ব্রাহ্মণ তখন বললে আগাগোড়া সব কাহিনী।

সাপ ওদিকে গিয়ে বাঘকে এ খবর দিয়েছে। বাঘ এলো সভায়। বাঘ বললে যুবরাজ মৃগয়ায় গিয়েছিলেন- বাঘের দুটো বাচ্চাকে তিনি মারেন—বাঘ তাই যুবরাজকে মেরে ফেলেছিল। যুবরাজের গলায় ছিল এই হার। হার নিয়ে বাঘ কি করবে।

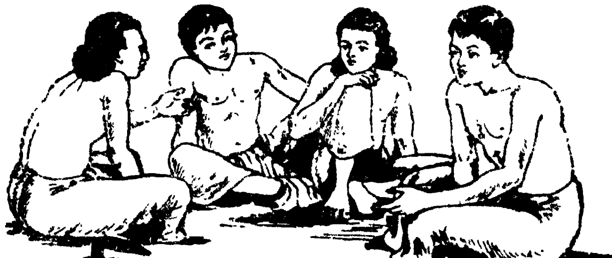
এই ব্রাহ্মণ তাকে বাঁচিয়েছিল কূয়া থেকে তুলে—ব্রাহ্মণ গরীব—তাই ব্রাহ্মণকে সে দিয়েছে এ হার।

বাঘ আরো বললে—সাপ, ইঁদুর আর এই স্যাঁকরা —এদেরো ব্রাহ্মণ প্রাণে বাঁচিয়েছিল কূয়া থেকে তুলে। সাপ আর ইঁদুর—খল হলেও তারা সে-উপকার ভোলেনি। কিন্তু এই স্যাঁকরা-মানুষ, এত-বড় বেইমান—এমন খল যে, রাজার কাছে পুরস্কার পাবে, এই লোভে ব্রাহ্মণের নামে মিথ্যা নালিশ করতে তার বাধেনি।

রাজা শুনলেন -শুনে তিনি হুকুম দিলেন—পাজী স্যাঁকরাকে হাত-পা বেঁধে গারদে রাখো—তারপর ওকে শূলে দেওয়া হবে। আর ব্রাহ্মণের নামে মিথ্যা নালিশ করার জন্য ওকে দিতে হবে একশো মোহর খেশারৎ এই ব্রাহ্মণকে। হীরের হার রাজা নিলেন, আর ব্রাহ্মণকে দিলেন তার দাম একথলি সোনার মোহর।

ব্রাহ্মণ লক্ষপতি হয়ে ঘরে ফিরলো।

পশুপাখী খল হোক—পেলে উপকার
অহিত করে না, বন্ধুর আচার।
মানুষ তেমন নয়! উপকার ভোলে—
অহিত সাধনে তার বুক নাহি দোলে।



বিদ্যা আর বুদ্ধি

চার বন্ধু···রাম, শ্যাম, যদু, মধু। চারজনে খুব ভাব! চার জনের মধ্যে রাম, শ্যাম আর যদু—তিনজনে শাস্ত্র-পুঁথিতে যত বিদ্যা লেখা আছে, তার সব বিদ্যা পড়ে মুখস্থ করে পণ্ডিত হয়েছে। তিনজনের বুদ্ধি কিন্তু অষ্টরম্ভা। মধুর শাস্ত্র-পুঁথি পড়তে ভালো লাগেনা—সে কোনো শাস্ত্র-পুঁথি পড়েনি-নিরেট মুখ্যু—কিন্তু তাহলে কি হবে, তার বুদ্ধি আছে।

একদিন বন্ধুরা বসে পরামর্শ করলো—এত বিদ্যা শিখে দেশের বাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকা ঠিক নয়। বিদেশে যাবে কোনো রাজার সভায়-সেখানে বিদ্যার জোরে রাজার কাছে চাকরি পাবে—অনেক টাকা রোজগার করবে।

রাম আর শ্যাম বললে মধুকে-তুমি মুখ্যু মানুষ—শাস্ত্র-পুঁথি পড়োনি—তোমাকে সঙ্গে নেবো না। তুমি ভেবেছো, আমরা বিদ্যার জোরে রোজগার করবো আর তুমি মজাসে নেবে আমাদের রোজগারের ভাগ। উঁহু—সেটি হবে না।

যদু বললে, আহা তা হোক! ছেলেবেলা থেকে চারজনে একসঙ্গে আছি—একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি। ও এখানে একলা কি করে থাকবে। না ভাই মধু—তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে। ওরা না দিক, আমি দেবো তোমাকে আমার রোজগার-করা টাকার ভাগ। চারজনে তখন বেরুল দেশ থেকে। এদেশ-ওদেশ পার হয়ে একটা জঙ্গলে—চারজনে এলো জঙ্গলে।

জঙ্গলে খানিকটা এগিয়ে যেতে তারা দেখে, এক জায়গায় একরাশ হাড় ছড়ানো রয়েছে—মরা সিংহের হাড়।

দেখে রাম বলল আমি যে-বিদ্যা শিখেছি, সে বিদ্যার জোরে এ-সব হাড় জড়ো করে যে জায়গার যে হাড়, ঠিক্ সে জায়গায় জুড়ে গোটা কঙ্কাল তৈরী করতে পারি।

শ্যাম বললে—আমি তাহলে আমার শেখা বিদ্যার জোরে সে হাড়ে মাংস চামড়া লাগিয়ে ওর দেহে রক্ত বইয়ে দিতে পারি।

যদু বললে—আর আমি যে-বিদ্যা শিখেছি, তার জোরে ওর দেহ প্রাণ দিয়ে সিংহটাকে জীবন্ত করে তুলতে পারি।

তিনজনে বললে—এসো, তিনজনে তাহলে নিজের নিজের বিদ্যার পরিচয় দিই।

এ-কথার পর হাড়গুলো কুড়িয়ে জুড়ে রাম সিংহের গোটা কঙ্কাল তৈরী করলো; তখন শ্যাম দিলে সে কঙ্কালে মাংস চামড়া আর রক্ত। যদু বললে—

এবারে আমি প্রাণ দিয়ে এ-সিংহকে জীবন্ত করবো, দ্যাখো।

সে প্রাণ দিতে যাবে, মধু বলে উঠলো—খবরদার এমন কাজ করো না! এটা দেখছি মরা সিংহ—এর প্রাণ দিয়ে বাঁচালে, এ আমাদের আস্ত রাখবে না, চারজনকেই খেয়ে সাফ করবে।

যদু বললে—বাঃ, ওরা দেখালো ওদের বিদ্যা, আর আমি দেখাবো না আমার বিদ্যা ?



মধু বললে দেখিয়ো ভাই—কিন্তু একটু সবুর করো আগে আমি ঐ বড় গাছটার মগডালে চড়ে বসি—তারপর তুমি দিয়ো মরা সিংহকে প্রাণ···দিয়ে বাঁচিয়ো।

মধু গিয়ে উঠলো বড় গাছের মগডালে–যখন যদু প্রাণ দিয়ে বাঁচালো সিংহকে।

বেঁচে উঠে সিংহ তখুনি তিন বন্ধুর ঘাড় মোট্‌কে তিনজনকে পুরলো পেটে। বিদ্যার দর্পে তিনজনের হলো মৃত্যু; আর মুখ্যু মধু—শুধু বুদ্ধির জোরে প্রাণে বাঁচলো।

যত বিদ্যা শেখো, যদি বুদ্ধি নাহি থাকে—
সর্ব-বিদ্যা মিথ্যা হবে, পড়িবে বিপাকে





গভীর বন। বনের মাঝখানে দেড়শো বছরের পুরোনো বিরাট এক বটগাছ। বটগাছের দুশো-তিনশো ডাল—সেই সব ডালে কাকেদের বাসা। রাজ্যের কাক এই গাছের ডালে ডালে বাঁসা বেঁধে বাস করছে চোদ্দ পনেরো পুরুষ ধরে। কাকের রাজ্য। তাদের রাজা আছে—রাজা-কাকের পাঁচ পাঁচ মন্ত্রী আছে—পাত্র মিত্র-সভাসদ কাক আছে, আর আছে হাজার-হাজার কাক ফৌজ।

বনের গায়ে খুব উঁচু পাহাড়। এই পাহাড়ের বুকে প্রকাণ্ড গুহা-সেই গুহায় দুশো পাঁচশো বছর ধরে বাস করছে রাজ্যের প্যাঁচা। প্যাঁচাদেরও রাজা আছে ? প্যাঁচা রাজারও পাঁচ-পাঁচ প্যাঁচা মন্ত্রী, প্যাঁচা অমাত্য-সভাসদ আর হাজার হাজার প্যাঁচা ফৌজ আছে।

প্যাঁচারা দিনের বেলায় গুহায় থাকে চুপচাপ—দিনের আলোয় তাদের চোখ ঝলসে ধাঁধা লাগে—

কিছু দেখতে পায় না, তাই দিনের বেলায় তারা বেরোয় না—প্যাঁচারা বেরোয় রাত্রে। রাত্রির অন্ধকারে তাদের চোখে জলুশ খোলে—ছোট-ছোট পোকা-মাকড় পর্যন্ত তাদের নজর এড়ায় না—রাত্রে তারা বেরোয় শিকার করতে।

কাকেরা রাত্রে চোখে ভালো দেখতে পায় না—রাত্রে তারা বাসায় থাকে চুপচাপ তারা বেরোয় দিনের বেলায়।

এখন রাজা-প্যাঁচা তার দলবল নিয়ে রাত্রে বেরোয়, আর কাকের রাজ্য বটগাছের কাছে এসে রোজ দু-দশটা করে কাক মেরে তারা উড়ে চলে যায়! কাকের উপর প্যাঁচাদের ভারী রাগ রোজ রাত্রে দু-দশটা করে কাক তারা মারবেই।

এমনিভাবেই দিন চলেছে কাকের দল মরে ছারখার হচ্ছে রাজা-কাক মহা ভাবনায় পড়লো। এর বিহিত না করলে প্যাঁচাদের হাতে কাকের বংশ যে একেবারে লোপ পাবে। মন্ত্রীদের ডেকে রাজা-কাক বললে—এমন শত্রু—এমন করে রোজ রোজ কাকক্ষয় —কি ব্যবস্থা করা যায়? পাঁচ মন্ত্রীর পাঁচ মত। এক মন্ত্রী বলে—সন্ধি করুন মহারাজ—প্রবল শত্রু! তাছাড়া কোথায় তাদের দুর্গ—কত তাদের ফৌজ যখন জানতে পারছি না—তখন সন্ধি।

দু-নম্বরের মন্ত্রী বললে উঁহু। যে শর্ত বলবে, যদি সে শর্ত না রাখতে পারি আমরা। আমি বলি, এই বটগাছ ছেড়ে বহু দূরে আর কোনো বনে

গিয়ে রাজ্য স্থাপন করুন মহারাজ নির্বিবাদে থাকবো।

তিন নম্বরের মন্ত্রী বললে—চোদ্দ পুরুষ এখানে বাস করছি—এ গাছ ছেড়ে কোথায় যাবো? তাছাড়া যে জায়গায় যাবো, সেই জায়গা যে নিরুপদ্রব হবে, নিরাপদ হবে—কে তা বলবে।

চার নম্বর মন্ত্রী বললে-যুদ্ধ করুন মহারাজ—শত্রু নিপাত হবে হোক্।

পাঁচ নম্বরের মন্ত্রী বললে-পাগল। তাদের শক্তি কত, যখন জানা নেই যুদ্ধে অনর্থক কাকক্ষয়—কে জানে, যুদ্ধে হয়তো কাকের বংশ একেবারে লোপ পাবে। আমি বলি মহারাজ অন্য কোনো পাখীর সঙ্গে মিত্রতা করে তার সাহায্যে প্যাঁচাদের শায়েস্তা করা হোক।

কোনো মন্তব্যই রাজা আর অমাত্যদের পছন্দ হলো না। রাজা বললে—মুস্কিল হচ্ছে প্যাঁচা-শত্রু কোথায় থাকে তা যখন জানা নেই, তখন কি করা উচিত, কি করা উচিৎ নয়, তা বোঝা যাচ্ছে না। আগে তাদের আস্তানার সন্ধান নেওয়া চাই।

কি করে তা নেওয়া যায়? তারা বেরোয় রাত্রে—রাত্রে কাকেরা চোখে কিছু দেখতে পায় না। দিনের বেলায় কাকেরা কোথায় না যায়—লোকালয়, ভাগাড়, শ্মশান—কোনো জায়গায় যেতে বাদ রাখে না—কখনো কোনো খানে একটা প্যাঁচার ছায়াও কেউ দেখেনি! তাদের আস্তানা কোথায়, আগে

জানা দরকার—তা না জানলে কোনো উপায় করা যাবে না।

কি করে আস্তানার সন্ধান মেলে ?

মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় উপায় মিললো না। কাক রাজা তখন গেল বুড়ো কাকের কাছে। মানুষ বুড়ো হলে যেমন সংসার ছেড়ে কাশীবাস করে—বুড়ো কাক তেমনি বুড়ো হয়েছে বলে আর-এক বনে এক গাছে বাসা বেঁধে থাকে। তার বয়স হয়েছে—অনেক দেখেছে শুনেছে সে, তার বুদ্ধি খুব বেশী। রাজ্যের বিপদ-আপদ ঘটলে কাকেরা যায় বুড়ো কাকের কাছে বুদ্ধি নিতে। রাজা-কাক এলো বুড়ো কাকের কাছে—এসে বিপদের কথা বলে কেঁদে ফেললো—বিহিত করো দাদামশায়। নাহলে কাকের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে বুড়ো কাক বললে—উপায় করবো কিন্তু তার আগে তোমাদের একটি কাজ করতে হবে।

রাজা-কাক বললে—কি কাজ ?

বুড়ো কাক বললে—ও গাছ ছেড়ে দলবল নিয়ে তোমাদের গিয়ে থাকতে হবে দূরে আছে মৃগ পর্বত—সেই পর্বতে। একদিনেই সকলে যাও। তোমরা চলে গেলে সেদিন রাত্রে আমি পড়ে থাকবো ঐ বটগাছের তলায়—তোমরা ঠোঁটে ঠুক্‌রে-ঠুক্‌রে আমার দেহ রক্তাক্ত করে যাবে। তোমরা চলে গেলে আমি চ্যাঁচাবো। তারপর যা করবার আমি করবো।

তোমরা সবাই এদিকে মোটেই আসবে না। তারপর আমি গিয়ে দেখা করে উপায় বলে দেবো। তখন হবে শত্রু নিপাত।

বুড়ো কাকের কথা মেনে কাজ হলো। কাকেরা সকলে সেই দিনই বাসা ছেড়ে চলে গেল মৃগ পর্বতে—বেলাথাকতে থাকতেই তারা চলে গেল। তারপর বুড়ো কাক হুমড়ি খেয়ে পড়লো বটগাছের তলায়—কটা কাক মিলে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে তার গায়ে করে দিলে ঘা—দিয়ে তারা উড়ে চলে গেল। বুড়ো কাক যন্ত্রণায় পড়ে মাগো-বাবাগো বলে চ্যাঁচাতে লাগলো।

মাঝরাতে রাজা-প্যাঁচা তার দলবল নিয়ে এলো বটগাছের কাছে—এসে বুড়ো কাকের চ্যাঁচানি শুনে গাছতলায় নামলো; নেমে বুড়ো কাকের দুর্দশা দেখে রাজা-প্যাঁচা বললে—কি হয়েছে গো তোমার? এমন চ্যাঁচাচ্ছো কেন!

বুড়ো কাক বললে—বলো কেন। কাকেদের মতিচ্ছন্ন হয়েছে। আমি ক্রমাগত ওদের বোঝাচ্ছি—প্যাঁচাজাত বলমান—প্যাঁচারাজ শক্তিমান—হয়তো কাকেরা কোনো অপরাধ করেছে, তাই প্যাঁচারা রোজ রোজ রাত্রে এসে কাক মারছে। তাই আমি বলেছিলুম—প্যাঁচারাজের কাছে যাও—গিয়ে তাঁকে বড় বলে মেনে রাজা বলে স্বীকার করে তাঁর অধীনে সামন্তরাজ হয়ে থাকো। তাতে রেগে আমাকে জাতি-দ্রোহী-দেশদ্রোহী বলে ঠুক্‌রে আধ-মরা করে ফেলে দিয়েছে। আমিও ছাড়বো না—এর শোধ নেবো।

জানি তো ওদের বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য। সে-সব বেফাঁস করে, কাকের জাতটাকে যদি না প্যাঁচার অধীন করতে পারি।

কথা শুনে রাজা প্যাঁচা বললে- বটে। তা আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো। আজ থেকে তুমি আমাদের বন্ধু।

বুড়ো কাককে নিয়ে প্যাঁচারা তখনি এলো নিজেদের গুহা-বাসায়? বুড়ো কাকের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলো। পাঁচ-সাতদিনে বুড়ো কাক একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলো।

সুস্থ হয়ে দিনের বেলায় সে এলো গুহার বাইরে। রাজা-প্যাঁচা বললে- বেরুচ্ছো কি। রোদে চোখ ঝল্‌সে যাবে—কানা হবে।

বুড়ো কাক বললে দিনের বেলায় আমাদের— কাকদের চোখে সহ্য হয়, রাত্রে চোখে কিছু দেখতে পাই না।

রাজা-প্যাঁচা বললে—তা বটে! আমাদের ঠিক উল্টো।

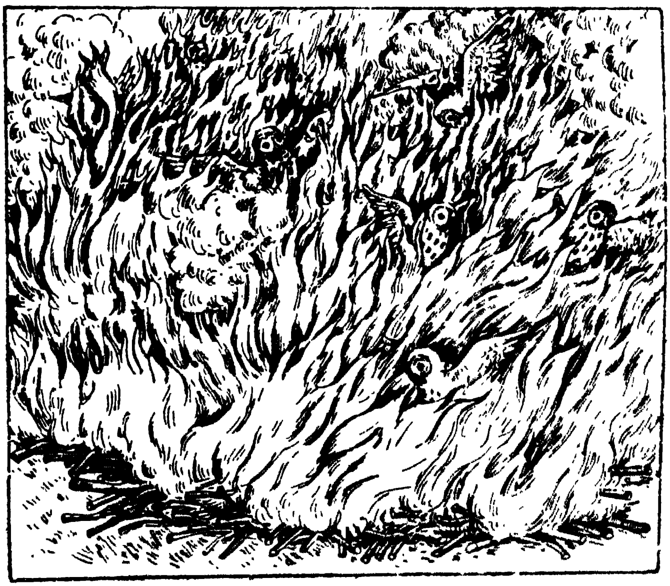
বুড়ো কাক বললে একটু উড়ে দেখি—নাহলে ডানাগুলো বাতে যদি অনড় হয়। উড়ে একটু ঘুরে আসি।

—ও। তা বেশ যাও।

বুড়ো কাক উড়তে উড়তে এলো মৃগ পর্বতে—এসে বললে- সব ঠিক। পাকা ব্যবস্থা। তোমরা এক কাজ করো- বনে যত শুকনো কাঠিকুটো পাও জড়ো

করো—করে তাতে মশাল তৈরী করো। তারপর ওরা যে গুহায় থাকে সেই গুহার সামনে কাল সকালে সেগুলো এনে জড়ো করে গুহার মুখ বন্ধ করে সাজাবে—সাজিয়ে লাগাবে তাতে আগুন ঠিক গুহার মুখে! তাহলেই ব্যাস্।

পরামর্শ দিয়ে বুড়ো কাক ফিরে এলো প্যাঁচাদের গুহায়। তারপর গুহার বাইরে মাঝে মাঝে সে আসে—দেখে, কাজ কেমন হচ্ছে। প্যাঁচারা গুহার মধ্যে



আছে নিশ্চিন্ত। দিনের বেলায় গুহার মুখেও তারা আসে না—দিনের আলো লাগবে চোখে।

সন্ধ্যা হবার আগেই কাকের দল কাঠিকুটো জড়ো করে যেন পাহাড় জমিয়েছে। সন্ধ্যা হয়-হয় বুড়ো

কাক এলো গুহার বাইরে—সকলে লাগালো আগুন।

সেই শুকনো কাঠকুটোর পাহাড়ে আগুন লাগানো হলো—দাউদাউ জ্বললো আগুন। গুহার মধ্যে ধোঁয়ায় ধোঁয়া—গুহা তেতে যেন জ্বলন্ত উনুন। প্যাঁচারা ছটফট্ করে সকলে মরলো। এ গুহার প্যাঁচাদের বংশে প্যাঁচা আর একটি রইলো না। কাকের দল মহাখুসী—এক চালেই শত্রু নিপাত।

১। **শত্রু যদি বলী হয়—যুদ্ধ অনুচিত।**
ফন্দা চাই। ফন্দীতেই হবে ঠিক জিত॥

২। **শত্রুর কাকেও বাপু করোনা বিশ্বাস।**
ফাঁক পেলে নিশ্চয় করিবে সর্বনাশ॥

